পুন্যভূমি ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক ইসলামী রূপকথা

জেরুজালেম অভিযান

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

পূণ্যভূমি ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক ইসলামী রূপকথা

জেরুজালেম অভিযান

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশনায়

দারুল ফুরকান

বাংলাবাজার, ঢাকা।

ভূমিকা

কান্নার ভেতরে থাকতে থাকতে মন হয়ে গেছে কান্না-প্রবণ। ভেতরে কান্না। বাইরে কান্না। শুধু কান্না। এ কান্নার যেনো শেষ নেই। মা হারিয়ে কান্না। বাবা হারিয়ে কান্না। পরিবারের আরও আরও প্রিয় মানুষ হারিয়ে নীরব অশ্রুপাত। গাজার ওই সমুদ্র যেনো ফিলিস্তিনিদের এক কান্না-সাগর।

এতো যে কান্না, এর ভেতরে আনন্দের কোনো উপলক্ষ্য যদি চলে আসে—মন্দ কী!

প্রিয় পাঠক,

এ বই সেই আনন্দেরই উপলক্ষ্য!

অনেক দুঃখ বেদনা ও স্বজন সুজন হারানোর শোকের মাঝে একটুখানি রুপোলি হাসি। অনাবিল হাসি। বিজয়ের দীপ্তিতে—দীপ্তিমান।

এ বই তোমাকে চোখে পানি থাকলেও মুখে এনে দেবে হাসি।

শাহাদতের লালের ঢেউয়েও এনে দেবে সবুজ শ্যামলিমাঘেরা ত্বীন যাইতুনের স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ বিকেল।

আর ...

সিন্দাবাদের অদৃশ্য ক্যাপটা?

ওহ হো, ওইটা মাথায় দিয়ে সিন্দাবাদ যখন ফিলিস্তিনের পূর্ব পুরুষের

ঐতিহ্যের খোঁজে একটা একটা করে সফল অভিযান পরিচালনা করবে, তখন তুমি হে পাঠক, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে আপন বিমোহিত অনুভূতির অবারিত জানালা দিয়ে! আর আপন মনে বলে উঠবে—

জানি না, বাস্তবেই আসবে কি না আমাদের উদ্ধার করতে কোনো সিন্দাবাদ!

আচ্ছা, এই বইয়ের গল্প বাস্তব না কাল্পনিক?

দুটোই!

চরিত্র তো কাল্পনিকই। আকাশ-মাদুরে উড়ে বেড়ানো সিন্দাবাদ, ওই অদৃশ ক্যাপটা, প্রিয় কবুতর উম্মে উররিফ—সবই লেখকের উর্বর কল্পনার সজীব পরিবেশনা। অন্যদিকে এই কিতাবে বর্ণিত ইতিহাস বাস্তবতার চোখে চোখ রেখেই সব সময় কথা বলেছে।

প্রিয় বন্ধু,

আমি যখন সিন্দাবাদের জেরুজালেম অনুবাদ করতে বসেছি, তখন ফিলিস্তিনে শুরু হয়েছে আরেক অভিযান—আলআকসা তুফান অভিযান। গত বছরের ৭ অক্টোবরে শুরু হওয়া এ তুফান অভিযান এখনও প্রলয়ঙ্করী। বদলে দিয়েছে তা ইসরাঈলের দৃশ্যপট। এবং খুব দ্রুতই বদলে যাবে পৃথিবীর দৃশ্যপট। ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় পাঠক,

এই তুফান অভিযানকালে আমাদের এই সিন্দাবাদের অভিযান পড়তে তোমার খুব মজা লাগবে আশা করি। এই বইয়ের পাতায় পাতায় একটি আনন্দ সফর 'আকাশ বিছানা'য় বর্ণিত হলেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে অনেক গল্প। চেনা অচেনা। জানা অজানা। এই অজানা ও অচেনাকে আবিষ্কার করতে চলো এবার যোগ দিই—প্রিয় সিন্দাবাদের সাথে!

আমার পরিচয়

জানো—আমি কে?
আমি সিন্দাবাদ! নভোচারী সিন্দাবাদ!
না না, আমি ভুল বলছিনা।
আসলেই আমি এক দুঃসাহসী নভোচারী?
নাহ। আমি আলিফ লায়লার মাঝি—সিন্দাবাদ নই।
আমি আরেক সিন্দাবাদ
আমি সমুদ্র বিচরণকারী নই।
আমি আকাশ বিচরণকারী। তাই বলে আমি পাখিও নই।
পাখির মতো আমার ডানাও নেই।
কিন্তু তবুও আমি আকাশে বিচরণ করি।
একদেশ থেকে উড়ে যাই আরেক দেশে।
খুব বিস্মিত হচ্ছো, না?
তাহলে আমি কেমন করে আকাশে উড়ে বেড়াই?
জানতে চাও?
এসো, তাহলে, শুরু থেকেই বলি।

আমার জন্ম লেবাননে, ফিলিস্তিনে তাঁবুপল্লীতে।

আমি যখন মাত্র কয়েকটিলের শিশু, তখন অশান্তি-প্রিয় দখলদার শত্রুরা লেবাননে আমাদের তাঁবুপল্লীর ওপর বোমা হামলা করে। সে কী ভয়ানক হামলা!

এই হামলায় শহীদ হলেন আমার বাবা, গাসসান এবং মা দালাল (دلال)।

জানোই তো, আমি তখন এবোরেই শিশু। দেখভাল করার সেখানে সেখানে কেউ ছিলো না। তাই প্রতিবেশিরা আমাকে সিরিয়ায় আমার দীদা-দাদুর কাছে পাঠিয়ে দিলো।

তখন থেকে আমি দাদা-দাদুর কাছেই বেড়ে উঠতে লাগলাম। কিন্তু দাদুর আদও বেশিদিন আমার কপালে জুটলো না। আমি যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি, তখন তিনি ভীষণ অসুখের কবলে পড়লেন। দীর্ঘ দুই মাস তিনি মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করে অবশেষে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

দাদুকে আমি খুবই ভালোবাসতাম। মাকে তো হারিয়েছি সেই ছোট্ট বয়সেই। এরপর থেকে দাদিই ছিলেন আমার সব।

তার ইন্তিকালে আমি যেনো দ্বিতীয়বারের মতো মাতৃমমতা থেকে বঞ্চিত হলাম।

কিন্তু পৃথিবী দয়া মায়ার অদ্ভুত এক জায়গা। একদিকে আসে দুঃখ বেদনা কষ্ট, আরেকদিকে মায়া মমতা এসে তা মুছে দিয়ে যায়। দাদির পর এগিয়ে এলেন দাদাভাই, রাজ্যেও স্নেহ মমতা নিয়ে। তার নাম কানআন। ছিলেন খুব স্নেহশীল। তিনি আমাকে আদরে আদরে সব দুঃখ ভুলিয়ে রাখতেন। দাটির ইন্তিকালের পর তার এই আদর ও স্নেহ আরও বেড়ে গেলো।

কিছুদিন পর তিনি শিক্ষকতার পেশা থেকে ইস্তফা দিলেন। বয়স আর কম হয় নি। সত্তর ছুঁইছুঁই।

এরপর থেকে আমিই সবসময়ের ব্যস্ততা। সুযোগ গেলেই ছুটে যেতাম দাদাভাইয়ের কাছে। আবদারের পর আবদার। গল্পের আবদারই করতাম বেশি।

দাদাভাই আমাকে খুব মজার মজার গল্প শোনাতেন। সে সব গল্প হয়ে উঠলো আমার অক্সিজেন। না শুনে থাকতেই পারতাম না। আশা আর মিটতো না। একটা গল্প শেষ হতে না হতেই আরেকটা গল্পের বায়না ধরতাম। দাদাভাই একটুও বিরক্ত হতেন না। বরং, আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি কওে একটু হাসতেন। তারপর আবার বলা শুরু করতেন।

এভাবে আমাকে যে কতো গল্প শুনিয়েছিলেন, তার কোনো হিসেব নাই। দাদাভাই হাসান শাতেরের গল্প। নুস নুসাইসের গল্প। সবুজ পাখির গল্প। ছোটো চড়ুইয়ের গল্প। আরও কতো কী!

মনে পড়ে- তিনি আমাকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইযুবী, নুরুদ্দিন জিনকী এবং রুকুনুদ্দীন জাহির বাইবাসের জীবন-গল্পো শুনিয়েছিলেন। এই মহা মনীষীর জীবন কথা শুনতে শুনতে আমি নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতাম।

একদিন দাদাভাই আমার কাছে সুন্দর সাদা ধবধবে ছোটো একটি কবুতর নিয়ে এলেন। কবুতরটি আমার রুমের জানালার কাছেই বাসা বেঁধেছিলো।

কবুতরটির সঙ্গে খুব দ্রুত আমার সখ্য গড়ে উঠলে আমি দানা-পানি দিলে ভীষণ খুশি হতো।

টুকটুক করে খেতো। এমনকি সে আমাকে এর বিনিময়ও দেওয়ার চেষ্টা করতো। আমার কামরার অনেক সময় আমার অসতকতা বশত ছোটো ছোটো খাবারের টুকরো পড়ে থাকতো। কবুতরটি প্রতি সকালে এসে করতো কি-নিচে-পড়ে-থাকা ছোটো ছোটো খাবারের টুকরোগুলো টপাটপ মুখে তুলে নিতো। আর ডানা ঝাপটে আনন্দ প্রকাশ করতো।

আর গ্রীষ্মকালে গরমটা যখন একটু বেশি পড়তো, তখন সে

আমার কামরায় এসে তার ছেটো ছোটো ডানা দিয়ে বাতাস করার চেষ্টা করতো।

মাঝে মাঝে সে আমাকে সুন্দর সুন্দর গল্পও বলতো। এভাবে সে-ই একসময় হয়ে উঠলো আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। বরং বান্ধবী।

কিছুদিনের মধ্যেই সে দাদাভাইয়ের সঙ্গেও বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললো, প্রায়ই সে তার রুমে ঢুকে লাইব্রেরীর বিশাল তাকে বা তার টেবিলের উপর গিয়ে বসে পড়তো।

তারপর টেবিলে ছড়ানো বইগুলোর উপর গভীর মনাযোগ দৃষ্টি বোলাতো। একটুপর পর আবার বইয়ের পৃষ্ঠাও উল্টাতো! তাই দাদাভাই কানআন তার নাম রেখেছিলেন 'উম্মে উররিফ'!

পুরস্কার

স্থান : দক্ষিণ দামেশক
কাল: শনিবার, ৮/৭/১৯ঈ

কদিন আগে সপ্তম শ্রেণির পরিক্ষা শেষ হয়েছে। এরপর থেকে রেজাল্ট হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছিলাম। অবশেষে আজ পেলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! পরিক্ষায় আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি!

খুশিতে উড়তে উড়তে গিয়ে হাজির হলাম দাদা ভাইয়ের কামরায়। ফলাফল দেখাতেই তিনি ভীষণ খুশি হলেন। বললেন-

'দারুণ ফলাফল! কী পুরস্কার চাও, বলো! তুমি শীঘ্রই আল কুদসে ঘুরতে যাচ্ছো আব্বু!'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

'সত্যি দাদাভাই?! কবে তাহলে?!'

দাদা ভাই মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন,

‘এবারের পরিক্ষায় তুমি খুব ভালো ফলাফল করেছো। এর পুরস্কার হিসেবে তুমি আল-কুদসে গিয়ে ঘুরে আসবে। সেই সঙ্গে তোমাকে একটি মোবাইল ফোনও গিফট করবো।’

আল-কুদসে ঘুরতে যাবো শুনে এমনিতেই আমি খুশিতে আটখানা। এর মধ্যে আবার মোবাইল শব্দটি কানে আসতেই খুশিতে যেনো ‘ষোলোখানা’ হয়ে গেলাম। দাদাভাইকে জড়িয়ে ধরে তার হাতে চুমু খেলাম। জানতে চাইলাম,

‘কিন্তু কিভাবে যাবো দাদাভাই?’

তিনি আমাকে শান্ত করে বললেন,

‘যেভাবেই হোক তুমি যাবে। আমাদের বিশাল বাড়িতে প্রবেশ করবে। বাড়ির বাগানে একটা বিশাল গাছের নিচে আমি গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম। তুমি সেই গুপ্তধনটাকেও সাথে করে নিয়ে আসবে।’

দাদাভাই খাটের নিচে হাত বাড়িয়ে একটা পুরোনো বাক্স বের করে আনলেন। আল কুদস থেকে আসার সময় তিনি বাক্সটি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। আরো তিন বছর আগে তিনি এই বাক্সের কথা আমাকে জানিয়ে ছিলেন। তবে এটা কিসের বাক্স—তা তিনি আমাকে স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে এর ভেতরে কী আছে। সেটা খুলে দেখার চিন্তাও কখনো আমার মাথায় আসে নি।

বাক্সটা খুলে দাদাভাই পুরোনো একটা লাইট বের করে আনলেন। কৌতুহল সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করেই বসলাম,

‘এটা কী দাদা ভাই?’

দাদাভাই কোনো জবাব দিলেন না। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে লাইটটা ঘষতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাইটের উপরের আবরণটা সরে গেলো। লাইটের ভিতর থেকে সাদা সাদা ধোঁয়া বের হতে লাগলো। সেই ধোঁয়া থেকে পুরো রুমে ছড়িয়ে পড়েছে মিষ্টি এক ঘ্রাণ।

কি অবাক কাণ্ড! মুহূর্তে এসে ধোঁয়াটা হয়ে গেলো দৈত্য!

‘আদেশ করুন জনাব! আপনার হুকুম শিরোধার্য!’

বললো দৈত্যটা। দাদুভাই মৃদু হাসলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমি জমে এতটুকুন হয়ে গেছি। এসব কী দেখছি আমি?

নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছি না। ভয়ে জাপটে ধরলাম দাদুভাইকে। দাদাভাই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন,

'ভয়ের কিছু নেই বাবা। এই দৈত্য আমাদের বন্ধু। উদয় হয়েছে আমাদের হুকুম তামিল করতে।'

দৈত্যটাও তখন বলল,

'ভয় পেয়ো না বন্ধু! আমি সিন্দাবাদ। আমি ছোটদেরকে ভালবাসি। বিপদে-আপদে তাদেরকে সহযোগিতা করি।'

দাদাভাই তখন বললেন,

'শোনো! আমার এই নাতিটা আল কুদসে ঘুরতে যাবে। তার জন্য খুব সুন্দর একটা ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দাও।'

দৈত্যটা বলল,

'তাই হবে, তাই হবে। আপনার নির্দেশ শিরোধার্য।'

আমি তখনও দাদাভাইকে জাপটে ধরেছিলাম। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস বললাম,

'দাদাভাই, আমার যে খুব ভয় করছে!'

'বল কি?! ভয় লাগবে কেন? বীরপুরুষরা আবার ভয় পায় নাকি।'

দৈত্যটা ধীরে ধীরে সে অদ্ভুত বাটিটা উপরে উঠাতে লাগলো। তারপর বলিষ্ঠ আওয়াজে বললো,

'আমি চাই সুন্দর একটা হাওয়াই মাদুর। আর সিন্দাবাদ-এর উপযোগী ছোট একটা ক্যাপ।'

ওমা হল কি! এ কথা বলতে না বলতে রুমের ভেতরে মাদুর এসে হাজির। মাদুরের উপর সোনালী রঙ্গের ছোট্ট একটা ক্যাপ। হাসি জলমল চেহারার নিয়ে দাদাভাই আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

‘এই হল তোমার বাহন। এই মাদুরে চড়েই তুমি যাবে আল কুদসে। ভয়ের কি আছে?! তোমার পোষা কবুতরটিকেও না হয় সঙ্গে নিয়ে গেলে। তার মত বিজ্ঞ পথপ্রদর্শক আর পাবে কোথায়?’

কবুতরটি জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছিল। দাদা ভাইয়ের শেষ কথাটি তার কানে যেতেই সে ফুরুত করে খোলা জানালা দিয়ে রুমে ঢুকে বলতে লাগলো,

‘তাই নাকি? আমি তাহলে যাচ্ছি তোমার সাথে।’

খুশিতে বাকবাকুম করতে করতে পুরো কামরায় ডানা ঝাপটিয়ে উড়তে লাগলো। তারপর শান্ত হয়ে ওয়ার্ডড্রপের এক কোণে গিয়ে বসল।

দাদাভাই আমার ক্যাপটির দিকে তাকিয়ে বললেন,

‘এই ক্যাপটি কিন্তু সাধারণ কোন ক্যাপ নয়। এই ক্যাপের আশ্চর্য একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এটা মাথায় দিলে কারো সাধ্য নেই তোমাকে দেখার। বিপদে-আপদে এটা তোমার অনেক কাজে আসবে।’

পুরো বিষয়টি আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দাদাভাইয়ের কথা শুনছিলাম। সব বুঝতে পেরে আমি ভীষণ খুশি হলাম। একটু আগের ভয়টা একদম কেটে গেল।

জানতে চাইলাম,

‘তাহলে আমরা কবে যাচ্ছি দাদাভাই?’

দাদাভাই বললেন,

‘এইতো আগামীকাল ইনশাল্লাহ।’

আমি বললাম,

‘রওনা হবো কোত্থেকে?’

তিনি জবাব দিলেন,

‘আল জামিউল ওমাবি থেকে। দামেস্কে অবস্থিত বিখ্যাত একটি মসজিদ।’

রাতে ফুরফুরে মেজাজে বিছানায় শুতে গেলাম। শুয়ে শুয়ে আগামী দিন নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা করতে করতে এক সময় ঢলে পড়লাম মিষ্টি ঘুমের কোলে।

ভ্রমণের সূচনা

স্থান : জামিউল উমাবী, দামস্কো।
রবিবার, সকাল, ৯ জুলাই ১৯১৭।

পরদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ব্যাগ গোছানো শুরু করে দিলাম। আমার মাদ্রাসার ব্যাগ থেকে ইতিহাসের বইটি বাদে বাকি সবগুলো বই বের করলাম। আপাতত এই ব্যাগটি এখন আমার সঙ্গে আল কুদসে যাবে। হাওয়াই মাদুর আর ক্যাপটা বেগে ভরলাম। মোবাইল ফোন আর চার্জার নিতেও ভুললাম না। সবশেষে দাদাভাইকে গিয়ে বললাম,

'আমি প্রস্তুত দাদাভাই!'

অমনি কোত্থেকে কবুতরটি উড়ে এসে বলল,

'আমিও প্রস্তুত। আমি তোমাদের আগে আগে জামিউল উমাবিতে চলে যাব।'

'ঠিক আছে, যাও! সাবধানে যেও!'

আমিও দাদাভাইয়ের সঙ্গে একটি সবুজ বাসে চড়ে জামিউল ওমাবির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পর জামিউল উমাবি মসজিদের খোলা চত্বরে কবুতরের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। এত বিশাল মসজিদ আগে কখনো দেখিনি। এক একটি আজানখানা যেন নীল আকাশ ছুড়ে ফেলেছে। মসজিদের প্রাচীরগুলো সুবিশাল। মাঝ চত্বরে ওযুর জন্য দৃষ্টিনন্দন একটি কূপ শোভা পাচ্ছে। কূপের স্বচ্ছ পানি টলটলে দৃশ্য দেখার মত। আমরা কুব্বার কাছাকাছি এক জায়গায় গিয়ে বসলাম। কবুতর উম্মে উররিফ গিয়ে বসলো দাদাভাইয়ের ডান কাঁধে।

তারপর দাদাভাইয়ের কানে ফিসফিসে কি যেন বলল। দাদাভাই আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন,

'আচ্ছা ভালো কথা তো। এই কবরের পেছনে সালাউদ্দিন আইয়ুবীর মাজার। এখানে এসেছি যখন একেবারে তার মাজার জিয়ারত করেই যাই কি বলো?'

আমিও মহাআনন্দে রাজি হয়ে গেলাম। এত বড় সুযোগ কি আর হাতছাড়া করা যায়। মসজিদের পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমরা সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর মাজারে গেলাম। মাজারের কাছে লোকজনের উপচে পড়া ভিড়। দাদাভাইও মিশে গেলেন সেই ভিড়ে। তারপর জিয়ারতকারীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন,

'সালাম আপনাকে হে মহান বীর! ক্রুসেডারদের নাপাক কবল থেকে যিনি স্বাধীন করেছেন বায়তুল মাকদিসকে, তাকে সালাম।'

মাজার জিয়ারত শেষে আমরা আবার জামিউল উমাবিতে ফিরে এলাম। দাদাভাই মিষ্টি হেসে বললেন,

'এবার তাহলে শুরু হোক তোমাদের শুভ যাত্রা। আমি ব্যাগ থেকে আমার হাওয়াই মাদুরটা বের করে মসজিদের খোলা চত্বরে বিছালাম। রওনা দেওয়ার আগ মুহূর্তে দাদাভাই আমাকে খামে-ভরা একটি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন—আল কুদস-এ গিয়ে মসজিদুল আকসার খতিব